২০১৯ লোকসভা নির্বাচন এবং বিকল্প রাজনীতির খোঁজ

মইদুল ইসলাম

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে আরো পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব পেল। ২০১৪ সালের মতো বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন শুধু পেল তাই না বরং গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় একুশটি আসন বেশি পেল (২৮২ থেকে ৩০৩) আর প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ ভোট বাড়াল (৩১ থেকে ৩৭.৪)।

এই নির্বাচনে ইভিএমকে যাঁরা দূষছেন তাঁরা নিজেদের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে বড়ো ভুল পথ অবলম্বন করছেন। প্রথমত, ভারতের ইভিএম-কে হ্যাক করার মাধ্যমে নির্বাচনে কারচুপি করা প্রায় অসম্ভব। কারণ ভারতের ইভিএম কোনো সফটওয়্যার দ্বারা চালিত হয় না যাকে বাইরে থেকে হ্যাক করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ভারতের ইভিএম পুরোটাই হার্ডওয়্যার দ্বারা চালিত যা একটি বড়ো ক্যালকুলেটরের মতো। যদি আগে থেকে হার্ডওয়্যারের সমস্যা না থাকে এবং সেটা পরীক্ষা করার জন্য ভিভিপ্যাট ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন বা আসল ভোটারদের প্রদত্ত ভোট যে ইভিএমে পড়েছে সেই ইভিএম-কে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং কঠিন নিরাপত্তাকে টপকে একেবারে বদলে না দেওয়া হয় এবং তা করতে গেলে এক-দুটো ইভিএম না বদলে বহু ইভিএমকে যদি পরিবর্তন না করা হয় তাহলে ইভিএম মারফত কোনো নির্বাচনী কারচুপি অসম্ভব। দ্বিতীয়ত ইভিএম সংক্রান্ত কারচুপি নিয়ে অভিযোগ করলে যে ভোটাররা পরাজিত দল বা প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন তাদের মতামতকে যেমন সম্মান জানানো হয় না তেমন গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অগুনতি ভোটারের মতকে অগ্রাহ্য করা হয় যা নির্বাচনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মোটেই কাম্য নয়। তাই এই নির্বাচনে বিজেপি-র জয় এবং বিজেপি বিরোধী দলগুলোর পরাজয়কে বোঝার জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য কারণকে চিহ্নিত করা যাক।

মোদীত্বের জয় এবং বিরোধীদের পরাজয় কেন?

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। এই ভোটে মানুষ একটা শক্তিশালী ও নির্ণায়ক নেতৃত্ব চেয়েছিল। তুলনায় বিরোধীদের মধ্যে কোনো একটি নেতা বা নেত্রী ছিল না যিনি জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন। ২০১৪ সালের মতো ২০১৯ সালের নির্বাচন আসলে মোদীত্বের দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের জয় হল। পৃথিবীজুড়ে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমেরিকা, ইউরোপ, তুরস্ক, রাশিয়া এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভারতে তা মোদীত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। মোদীত্বের রাজনীতি আসলে হিন্দুত্বের রাজনীতির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নতুন করে কল্পনা করার প্রয়াস। এহেন রাজনীতি প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সুরক্ষা- কেন্দ্রিক দেশপ্রেম, মোদীর পিছিয়ে পড়া জাতিগত এবং গরিব পরিবার থেকে উঠে আসার পরিচিতিগুলোকে সুচারু রূপে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার কৌশল। এক্ষেত্রে মোদীত্বের রাজনীতিকে এক দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের রাজনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরি যার মধ্যে প্রবল কেন্দ্রীকরণ এবং স্বৈরাচারী ঝোঁক আছে। কিন্তু সেই রাজনীতিকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট রাজনীতি বলা ঠিক হবে না কারণ ভোটের এমন বালাই যে ভোটে জিততে হলে অনেকসময় বিজেপি-কে এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয় যা সাম্প্রদায়ি-কে ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ সমর্থন করবে না। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট ভাবধারার সংগঠন বলতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্‌সেবক সংঘের নাম সবার আগে করতে হয়। সংঘ পরিবারকে নির্বাচনে লড়তে হয় না কিন্তু তারা বিজেপি-কে মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক সাহায্য করে থাকে। মোদীত্বের দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ তাই পৃথিবীর অন্যান্য দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। অন্যান্য

দেশের দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদকে কোনো সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট সংগঠন সরাসরি সমর্থন জোগায় না।

প্রথমত, এই নির্বাচন ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের মতো একটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আকারে প্রচার করা হয়েছিল যেখানে একটি রাজনৈতিক দলের কিংবা স্থানীয় নেতা বা স্থানীয় সাংসদের থেকে একজন শক্তিশালী নেতার ভাবমূর্তি গড়ে সেই নেতার প্রতিমূর্তি-কে ভোট দেবার আহ্বান করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর মোদী গত পাঁচ বছরে একটা রাষ্ট্রীয় জনমোহিনী রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এহেন রাষ্ট্রীয় জনমোহিনী রাজনীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের প্রকল্পকে ভোটারের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেবার নীতি। সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটিজ (সিএসডিএস)-এর উত্তর নির্বাচনী সমীক্ষা যা ভারতীয় নির্বাচক ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তার ফল সেরকম বলছে। সিএসডিএস-এর সমীক্ষা অনুযায়ী এই সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে উজ্জ্বলা যোজনা (বিনা পয়সায় রান্নার গ্যাস সংযোগ), স্বচ্ছ ভারত অভিযান যার ফলশ্রুতি হিসেবে গরিব মানুষের জন্য শৌচালয় নির্মাণ ব্যবস্থা, জন ধন যোজনা (গরিব মানুষের জন্য ব্যাঙ্ক পরিষেবা) এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গৃহ নির্মাণ প্রকল্প) সবথেকে বেশি মানুষের কাছে মোদীত্বের প্রভাবকে বিস্তার করেছে। আর ঠিক নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী কিষান (কৃষক পরিবারকে বছরে ছয় হাজার টাকা) আর আর্থিক উপায়ের নিরিখে সরকারি চাকরি আর উচ্চশিক্ষায় ১০ শতাংশ সংরক্ষণ, কৃষক এবং উচ্চবর্ণের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ভোটকে বিজেপি-র পক্ষে সংহত করতে সাহায্য করেছে। তৃতীয়ত, সামাজিক মাধ্যমে (মূলত ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, টুইটার এবং ইউটিউব) গত পাঁচ বছরে যে পরিমাণ ঘৃণা ও মিথ্যা খবর সংখ্যালঘু এবং বিজেপি বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে ছড়ানো হয়েছে এবং অন্যদিকে মোদীর জন্য ওই সামাজিক মাধ্যমে যে পরিমাণ প্রচার করা হয়েছে তা অভাবনীয়। এই প্রচার সম্ভব হয়েছে বিজেপি-র কাছে অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অধিক মাত্রায় টাকা থাকার ফলে। অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনী বন্ডের ক্ষেত্রে বিজেপি-র খাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ টাকা গেছে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির পিছনে যে সামাজিক জোট সমর্থন জুগিয়েছিল যথা কর্পোরেট পুঁজি, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সিংহভাগ অংশ, কর্পোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বড়ো প্রচারমাধ্যম, সংঘ পরিবারের প্রচুর শাখা সংগঠন, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ, অল্পবয়সি এবং প্রথম বার ভোটারের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ এবং উচ্চবর্ণের গরিব মানুষের একাংশ, সেই সামাজিক জোট ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মোদীত্বের জয়গানে অটুট থেকেছে। তা ছাড়া আরো কিছু নতুন অংশের ভোটার মোদীর জনসমর্থন বাড়িয়েছে। যেমন উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে, যাদবরা এই নির্বাচনে অনেকে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন। সমাজবাদী পার্টি বা রাষ্ট্রীয় জনতা দলকে নয় যেমন তাঁরা বছরের পর বছর ওইসব আঞ্চলিক দলগুলোকে ভোট দিতেন। আবার পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে জাঠেরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় লোক দল বা সমাজবাদী পার্টিকে নয় যেমন তাঁরা গত বছর পর্যন্ত কয়েকটি লোকসভা উপনির্বাচনে ওই আঞ্চলিক দলগুলোকে সমর্থন করেছিলেন। আবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র পক্ষে আদিবাসী, দলিত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ভোট ব্যাপক হারে বেড়েছে। বাংলায় বিজেপি ২০১৪ সালে উচ্চবর্ণীয় ভোটারদের বিশেষ করে টানতে পেরেছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যে বিজেপি একদিকে যেমন তাদের সমর্থন বাড়িয়েছে (২৪ থেকে ৫৭ শতাংশে) তেমন দলিতদের মধ্যে তা ২০ থেকে ৬১ শতাংশে, ওবিসিদের মধ্যে ২১ থেকে ৬৫ শতাংশে এবং আদিবাসীদের মধ্যে পাঁচ গুণের উপরে (১১ থেকে ৫৮ শতাংশ) বিজেপি-র ভোট বেড়েছে।

সিএসডিএস-এর সমীক্ষা অনুযায়ী এই নির্বাচনে অভাবনীয় রকম সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ হয়েছে। ২০১৪ সালের মতো এবারেও মাত্র ৮ শতাংশ মুসলিম সারা দেশে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে। আর খ্রিস্টান এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে থেকে মাত্র ১১ শতাংশ করে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটারের মধ্যে ৪৪ শতাংশ বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে এবং আরো ৮ শতাংশ বিজেপি-র সহযোগী দলদের ভোট দিয়েছে। অর্থাৎ ২০১৯ লোকসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট হিন্দুদের মধ্যে থেকে ৫২ শতাংশ সমর্থন পেয়েছে। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা-কে বাদ দিলে আসাম, বিহার, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি এবং ঝাড়খণ্ডে হিন্দু ভোটাররা উল্লেখযোগ্য হারে এনডিএ-কে ভোট দিয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু ভোটাররা এনডিএ-কে সব থেকে কম ভোট দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে (৫৭ শতাংশ) এবং সবথেকে বেশি ভোট দিয়েছে আসামে (৭০ শতাংশ)।

এছাড়া গত পাঁচ বছরে মোদীত্বের নীতি গান্ধী, প্যাটেল, সুভাষ বসু এবং আম্বেদকরকে বিভিন্ন সরকারি প্রচারমাধ্যমের অঙ্গ করে তুলেছিল। কংগ্রেস কিন্তু গত পাঁচ বছরে মতাদর্শগতভাবে এই লড়াইটা সামনে আনতে পারেনি যে সংঘ পরিবারের মতাদর্শের সঙ্গে কংগ্রেসি ঘরানার গান্ধী, প্যাটেল এবং নেতাজির কী বিরোধ ছিল এবং আম্বেদকর কেন সংঘ

পরিবারের রাজনীতির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সংঘ পরিবারের খুব উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগৎ সিং, সুখদেব থাপার, শিবরাম রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকুল্লাহ খান, বিনয় বসু, সুধীর গুপ্ত ওরফে বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, ক্ষুদিরাম বসু, যতীন দাস, সূর্য্য সেন, মৌলানা আজাদ, খান আব্দুল গফফর খান, মাতঙ্গিনী হাজরা, শাহনওয়াজ খান এবং আরো বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর দেশের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ, বলিদান এবং অবদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে তার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়া হিন্দুত্ববাদী বিনায়ক দামোদর সাভারকারের কাপুরুষোচিত মুচলেকার কোনো তুলনা হয় না। এই ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের ইতিহাস এবং তার বিরুদ্ধে আগ্রাসী মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে বিরোধীরা ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস দলটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রচার করতে পারেনি। ন্যায় প্রকল্প, বেকারত্ব এবং কৃষক দুর্দশা নিয়ে যে আগ্রাসী প্রচার করার দরকার ছিল তার তুলনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

বাংলার প্রেক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গত বছর পঞ্চায়েত ভোটে ব্যাপক রিগিং হয়েছিল, ভুরি ভুরি ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে উঠেছিল এবং যে ভোটে প্রায় ৩৪ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে, ৩৩ শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং ২৪ শতাংশ জেলা পরিষদের আসনে শাসকদল জিতেছিল যেখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বিরোধীদের সঙ্গে শাসক দলের অনেক ভোটার গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। তাই সেই জমে থাকা ক্ষোভ ও তৃণমূলকে উচিত শিক্ষা দেবার তাগিদ থেকে বহু মানুষ শাসক দলের বিরুদ্ধে এবার ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের বিরোধীশূন্য করার প্রবণতার ফলে তৃণমূল বিরোধী ভোট রাজ্যে বিজেপি-র দিকে সংহত হল। বাংলায় বামফ্রন্টের সিংহভাগ ভোট বিজেপি-র দিকে গেছে। এই প্রবণতা ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং গত তিন বছরে বিভিন্ন উপনির্বাচনে দেখা গিয়েছিল। ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের সিঙ্গুর রায়ের পর বামফ্রন্ট তাদের আমলের ভুলগুলো মানুষের কাছে খোলা মনে স্বীকার না করে, কেন্দ্রবিরোধী গণ আন্দোলন ও রাজ্য স্তরের অনেক ইস্যু নিয়ে ব্যাপক লড়াই আন্দোলন না করার ফলে তারা মানুষের থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হল। এমতাবস্থায় বাংলার সিপিআই(এম) ক্রমাগত কংগ্রেস নির্ভরতায় ভুগছিল। তাই যখন ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআই(এম)-এর শেষপর্যন্ত কোনো নির্বাচনী জোট হল না তখন তৃণমূল বিরোধী এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষ বুঝলেন যে কেন্দ্রে যেহেতু বিজেপি সরকার এবং তৃণমূলকে শায়েস্তা করতে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস অপারগ এবং তাদের জোট না হওয়াতে তারা আরো দুর্বল তাই অযথা ভোট নষ্ট করে লাভ নেই। বিজেপি-কে ভোট দিয়ে যদি তৃণমূলকে জব্দ করা যায় এই ভাবনা থেকে অনেকে ভোট দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় বাংলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল বামফ্রন্ট আর সবথেকে লাভবান হল বিজেপি। গত পাঁচ বছরে লোকসভা ও বিধানসভার নিরিখে বিজেপির ভোট এবং আসন সবথেকে বেড়েছে এবং বামফ্রন্টের সবথেকে কমেছে (দেখুন সারণি-১)।

সারণি-১

লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে বাংলায় মুখ্য দলগুলোর প্রাপ্ত আসন ও ভোট শতাংশ

দল	২০১৪ আসন	২০১৪ ভোট	২০১৬ আসন	২০১৬ ভোট	২০১৯ আসন	২০১৯ ভোট
তৃণমূল	৩৪	৩৯.৭৯	২১১	৪৪.৯১	২২	৪৩.৩০
বিজেপি	২	১৭.০২	৩	১০.১৬	১৮	৪০.৩০
বামফ্রন্ট	২	২৯.৯৫	৩৩দ	২৫.৬৯দদ	০	৭.৪৬
কংগ্রেস	৪	৯.৬৯	৪৪	১২.২৫	২	৫.৬১

দ্রষ্টব্য: দ বামফ্রন্ট সমর্থিত এক নির্দল বিধায়ক নিয়ে
দদ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয়েছিল

সূত্র: ভারতের নির্বাচন কমিশন

কিন্তু শুধু গত পাঁচ বছরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দিয়ে এই রাজ্যে বিজেপি-র উত্থানকে বোঝা যাবে না। বিজেপি-র উত্থানের পিছনে নির্দিষ্ট কিছু আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। স্বাধীনতার পর বাঙালি আর অবাঙালিদের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় প্রায় একটা অলিখিত চুক্তি ছিল যে রাজনীতি মূলত বাঙালিদের হাতে থাকবে এবং বাংলার রাজনীতি, বাঙালিরা নিয়ন্ত্রণ করবে। অবাঙালিরা তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং কাজ নিয়ে থাকবে কিন্তু রাজনীতিতে তারা সরাসরি প্রবেশ করবে না বা বাংলার রাজনীতি তারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে না। গত তিন দশকে দেখা যাচ্ছে যে অবাঙালি জনসংখ্যা বাংলায় তাৎপর্যপূর্ণ হারে বেড়েছে এবং অবাঙালিদের মধ্যে থেকে আজ অনেকে সরাসরি বাংলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে— নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী হচ্ছে। পিছন থেকে রাজনীতির কলকাঠি নাড়ছে আরো কিছু অবাঙালি কুশীলবরা। অবাঙালি অংশের মানুষ বাংলায় এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। তার একটা প্রতিফলন হল উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের মুখ্য আরাধ্য দেবতাদের কেন্দ্র করে ধুমধাম করা পুজো এবং পুজো-কেন্দ্রিক মিছিল। বাঙালি হিন্দু মূলত শাক্ত ঘরানার এবং তাই তারা বিশেষ করে মাতৃদেবীর আরাধনা করেন। তাই বাংলায় মূল পুজো উৎসব দেবতাদের তুলনায় দেবীদের হয়— দুর্গা, কালী, চণ্ডী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শীতলা, মনসা ইত্যাদি। বাংলায় দেবীদের পরে শিব এবং রাধা-কৃষ্ণ অনেক বেশি জনপ্রিয় রাম-হনুমানের থেকে। আবার বাংলায় বিশ্বকর্মা পুজোর জাঁকজমক কমেছে। তুলনায় গত কয়েক বছরে আমাদের রাজ্যে পশ্চিম ভারতের মতো গণেশ পুজোর দাপট বেড়েছে। এই রাজ্যে পুজো-অর্চনার নাম করে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য দেবতাদের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে মিছিল সচরাচর দেখা যেত না। অবাঙালি রাজনৈতিক সংস্কৃতির হাত ধরে বাংলায় এই নতুন রীতি আমদানি করা হচ্ছে। অন্যদিকে জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক থেকে জনপ্রিয় বাংলা সিনেমাতেও হিন্দি সংস্কৃতির বেশ কিছু চিহ্ন, হিন্দি গান এবং হিন্দি সংলাপ প্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে যেখানে শৈল্পিক দিক থেকেও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ বিগত কয়েক বছরে একটি উত্তর এবং পশ্চিম ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্যে দিয়ে বাংলাকে যেতে হচ্ছে এবং নবীন প্রজন্ম বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতিচর্চা প্রসঙ্গে বেশ উদাসীন। এইরকম একটা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজেপি-র উত্থান যেখানে বর্তমান আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিজেপি-র বাড়বাড়ন্তকে সাহায্য করেছে।

বিকল্প রাজনীতির খোঁজে

বিজেপি-কে বাংলায় রুখতে প্রগতিশীল রাজনীতির কছে অন্তত দুটো রাস্তা আছে। সেই রাস্তা একটা-দুটো নির্বাচনে কেবল স্বল্পমেয়াদি কৌশল নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি-কেন্দ্রিক একটা শক্তপোক্ত মতাদর্শগত রাজনীতির। তার কারণ বিজেপি-র নির্দিষ্ট মতাদর্শ আছে এবং আরএসএস-এর মতো একটা শৃঙ্খলাপরায়ণ সাংগঠনিক মদত আছে। দুটো বিকল্প রাস্তার মধ্যে এক হল দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের রাজনীতি করা। এই বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ কিন্তু পুরাতন ধাঁচের ট্রেড ইউনিয়ন-কেন্দ্রিক কমিউনিস্ট রাজনীতি দিয়ে হবে না। সেটা গত কয়েকটা নির্বাচনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বরং বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ যেখানে থাকেন সেখানকার স্থানীয় দাবিগুলোকে সামনে রেখে রাজনীতি। এছাড়া অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছোটো পুঁজি এবং কৃষক ও খেতমজুরদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে নিরলস লড়াই আন্দোলন করা। তা ছাড়া সামাজিক বিভিন্ন পপুলার ইস্যুগুলো যেমন কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিক পরিষেবাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লড়াই আন্দোলন ও দুর্নীতিবিরোধী গণআন্দোলন। এহেন ইস্যুগুলো ছাড়া দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু মানুষের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক দাবি এবং তার সঙ্গে তাদের মর্যাদা ও সম্মানকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত লড়াই আন্দোলন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে বামফ্রন্ট আমলে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক রাজনৈতিক নেতৃত্ব দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু মানুষের নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে তেমন রাজনৈতিক আন্দোলন করেনি। শ্রমিক এবং কৃষকের শ্রেণি রাজনীতি করতে গিয়ে এই আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষকে বাম রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা যায়নি। আবার বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দশকে নবউদারবাদী আর্থিক নীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে শ্রেণি রাজনীতির নীতিগুলোর সঙ্গে আপোশ করা হয়েছিল। ফলে বামফ্রন্ট গরিব এবং খেটে-খাওয়া মানুষের থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। যখন দলিত এবং আদিবাসী মানুষ এবার উল্লেখযোগ্য হারে বাংলায় বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে তখন এক নব্য ঘরানার বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদকে দলিত এবং আদিবাসী মানুষের দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম করা ছাড়া কি আর কোনো উপায় আছে?

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করার দাবিকে সামনে রেখে একটা সুদৃঢ় ফেডেরালিস্ট রাজনীতি প্রগতিশীলরা করতে পারে। এহেন রাজনীতি বামেরা ১৯৮০-

র দশকে কিছুটা করেছিল কিন্তু সেই রাজনীতি মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্ত করা এবং রাজ্যগুলোকে আরো ক্ষমতা প্রদান করার দাবিকে সামনে রেখে রাজনীতি। কিন্তু সেই রাজনীতি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক জাগরণের রাজনীতি ছিল না। একবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ফেডেরালিস্ট রাজনীতি কিন্তু রাজ্যগুলোর অধিক ক্ষমতার দাবির সঙ্গে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাগরণ, সংঘ পরিবারের 'হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের' লক্ষ্যকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এক বিকল্প রাজনীতি হতে পারে। আঞ্চলিক ভাষাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আমাদের শেখার আছে। তামিলনাড়ুতে যেমন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি ক্ষমতা থেকে বহু দূরে ঠিক তেমন বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কিন্তু ইসলামাবাদী দলগুলোকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে সফল হয়েছে।

বাংলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভারতের বহু প্রদেশের তুলনায় বাংলায় স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থাৎ বাঙালির না আছে বড়ো পুঁজি না আছে বড়ো ব্যাবসা-বাণিজ্য। বাংলায় যারা বড়ো এবং কর্পোরেট পুঁজির মালিক তারা মূলত অবাঙালি। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। বাংলায় উৎপাদন শিল্পের এমন দৈন্য দশার ক্ষেত্রে বাংলায় অবাঙালি মুৎসুদ্দি পুঁজির উদাসীনতা ও অপারগতা নিয়ে কিন্তু তেমন চর্চা হয় না। দশকের পর দশক বাংলায় থেকে এই অবাঙালি মুৎসুদ্দি পুঁজি কিন্তু এই রাজ্যে শিল্প উৎপাদন নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। এক্ষেত্রে বাঙালি মূলত কৃষক, খেতমজুর এবং মধ্যবিত্ত চাকুরে। অর্থাৎ বাংলায় শ্রেণি এবং ভাষাভিত্তিক জাতির একটা যোগসূত্র আছে। অর্থাৎ শ্রেণি রাজনীতি করতে গেলেও বাংলায় তার একটা সাংস্কৃতিক রূপ যে দেওয়া সম্ভব সেটা হয়তো ফেডেরালিস্ট রাজনীতির ধারক এবং বাহকরা আরেকটু গভীরে গিয়ে ভাবতে পারেন এবং রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন। তাই হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেমন বাঙালিকে লড়তে হবে তেমন বাঙালির আর্থ-সামাজিক দাবি— বিশেষ করে ব্যাবসা করার সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাঙালিকে তার নিজের স্বার্থ দেখার জন্য বাংলায় এক নব্য ঘরানার ফেডেরালিস্ট রাজনীতি করা সম্ভব। বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ এবং ফেডেরালিস্ট রাজনীতি কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে অনেক ইস্যুতে একসঙ্গে আন্দোলনও করতে পারে এবং সমঝোতা করে চলতে পারে। রাজনৈতিক ময়দানে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রতিপক্ষ যখন সংঘ পরিবার মদতপুষ্ট ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, তখন সুদূরপ্রসারী বিকল্প রাজনীতি করার ক্ষেত্রে বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ এবং ফেডেরালিস্ট রাজনীতিকে নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া কি আর উপায় আছে?

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা
১৬-৩০ জুন ২০১৯ ১-১৫ আষাঢ় ১৪২৬

মূল্য : ২০ টাকা